আশ্চর্য জলজ প্রাণীরা

বাংলাদেশের ডলফিন, তিমি,
হাঙ্গর, শাপলাপাতা মাছ
এবং সামুদ্রিক কচ্ছপ

আশ্চর্য জলজ প্রাণীরা

বাংলাদেশের ডলফিন, তিমি, হাঙ্গর, শাপলাপাতা মাছ এবং সামুদ্রিক কচ্ছপ
ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত

বাড়ি নং ৮৯, রোড ২, সোনাডাঙ্গা আ/এ (১ম ফেইস), খুলনা-৯০০০।
emansur@wcs.org, ০১৬১২২২৮৮০০
অলঙ্করণ: ফারহানা আখ্‌তার, এলিজাবেথ ফাহ্‌রনি মনসুর এবং আব্দুল্লাহ-আল-মাসুদ
রচনা: এলিজাবেথ ফাহ্‌রনি মনসুর, ব্রায়ান ভি. স্মিথ, ফারহানা আখ্‌তার, ড. জাহাঙ্গীর আলম এবং রুবাইয়াত মনসুর

শিক্ষামূলক কাজে এর পুনঃ প্রকাশনা ও প্রতিলিপি তৈরির জন্য উৎসাহিত করা যাচ্ছে।
এই বইটি সহ অন্যান্য তথ্যাদি আপনারা জানতে পারবেন
আমাদের ওয়েব সাইট bangladesh.wcs.org - এ।
বাংলাদেশে প্রকাশিত, দ্বিতীয় সংস্করণ এপ্রিল ২০১৬

আমাদের দেশে জালের মত ছড়িয়ে আছে শত শত ছোট-বড় নদী। এই নদীগুলো প্রবাহিত হচ্ছে বঙ্গোপসাগরে।

আসুন, আমাদের নদী, উপকূল আর বঙ্গোপসাগরের গভীর পানিতে ডুব দিয়ে ঘুরে আসি এবং এতে বাসকারী আশ্চর্য প্রাণীদের সম্পর্কে ভালভাবে জানি।

ডলফিন ও তিমি

ডলফিন ও তিমি সারাজীবন পানিতে কাটায়। এরা কিন্তু মাছ নয়। এরা আমাদের মতই স্তন্যপায়ী প্রাণী ও বাতাস থেকে শ্বাস নেয়। শ্বাস নেয়ার জন্য এদেরকে অবশ্যই পানির উপর ভেসে উঠতে হয়। পানির নিচে আটকা পড়লে এরা দমবন্ধ হয়ে মারা যায়।

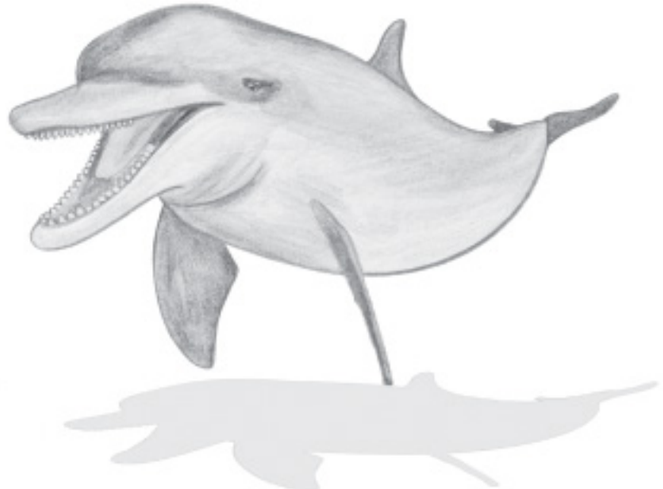

মা ডলফিনরা জীবন্ত বাচ্চা জন্ম দেয় - এদেরকে ইংরেজিতে কাফ বলা হয়। মা ডলফিন বাচ্চাদের দুধ পান করায় এবং যতদিন পর্যন্ত বাচ্চারা স্বাবলম্বী না হয় (অর্থাৎ নিজেরা নিজেদের দেখাশোনা করতে না পারে) ততদিন এদের যত্ন নেয়।

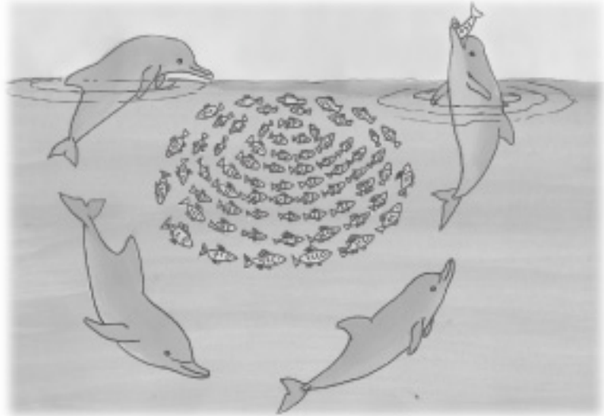

বোতলনাক ডলফিনরা মাছ ধরছে

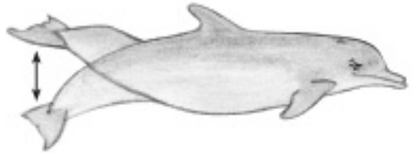

সামুদ্রিক ডলফিনরা দল বেঁধে মাছের ঝাঁককে একত্রিত করে শিকার করে। এভাবে খুব সহজেই ধারালো দাঁতের মাধ্যমে এরা মাছ ধরতে পারে।

মাছ ও ডলফিনের পার্থক্য বোঝার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে এর লেজের দিকে তাকানো। ডলফিনের লেজ আড়াআড়ি যা উপরে-নিচে নড়ে। মাছের লেজ খাড়া যা পাশাপাশি নড়ে।

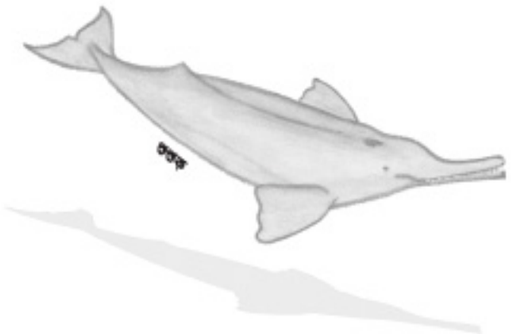

বাংলাদেশ তার ক্ষুদ্র জলসীমায় ডলফিন ও তিমির এক অসাধারণ বৈচিত্র্যকে ধারণ করছে। বিশ্বের ৮০টিরও বেশি প্রজাতির ডলফিন-তিমির মধ্যে বাংলাদেশেই পাওয়া গেছে ১০ প্রজাতি।

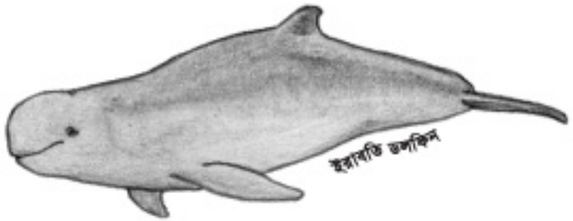

বেশিরভাগ ডলফিনই আমাদের উপকূলীয় জলাশয়ে এবং অতলস্পর্শ বা সোয়াচ- অব-নো- গ্রাউন্ড নামক গভীর গিরিখাতে বাস করে। এদের মধ্যে কিছু ডলফিন বাস করে জোয়ার-ভাটা প্রবন সুন্দরবনের নদ-নদীতে। আর শুশুক বাস করে সুন্দরবনেসহ আমাদের অন্যান্য নদীসমূহে।

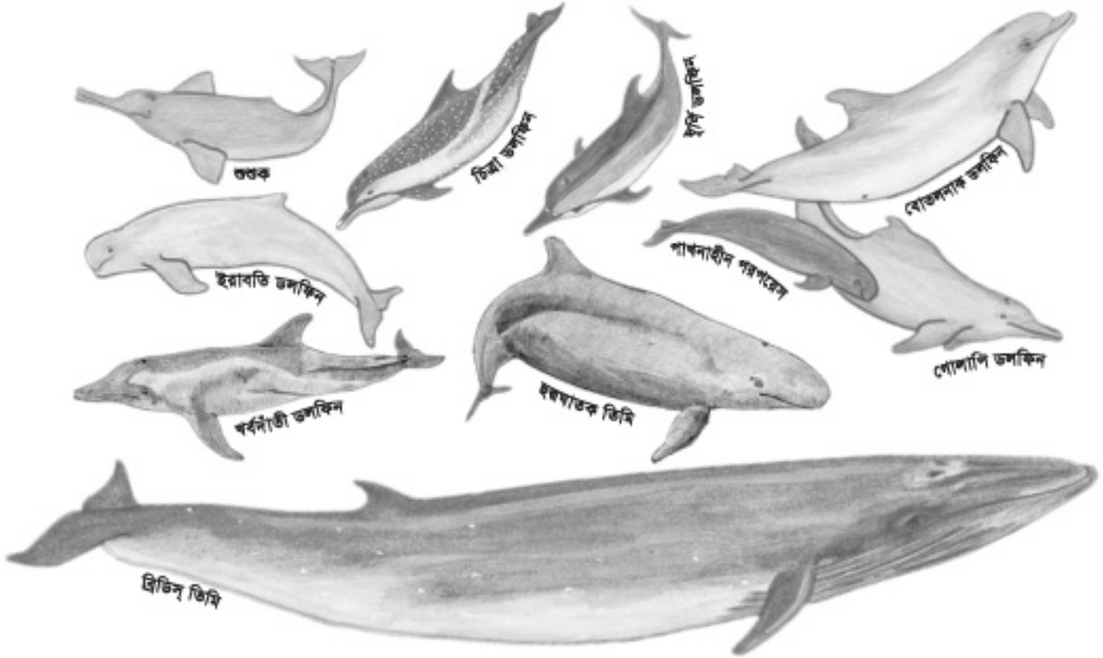

বাংলাদেশে মিষ্টি পানির উপর নির্ভরশীল দুই ধরনের ডলফিন দেখা যায়:
শুশুক এবং ইরাবতি ডলফিন।

বাংলাদেশ এবং উত্তরে ভারত ও নেপালের অনেক নদীতে শুশুক দেখা যায়। এরা সাধারণত নদীর বাঁকে ও মোহনায় একাকি বা ছোট ছোট দলে থাকে।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ইরাবতি ডলফিনের দল বাস করে সুন্দরবন এবং সংলগ্ন জলাশয়ে।

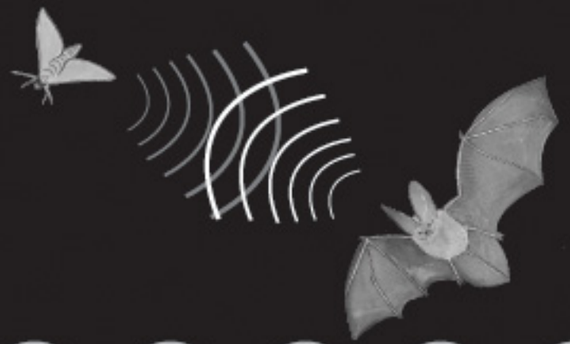

বেশিরভাগ ডলফিনই ভালভাবে দেখতে পায়, তা সত্ত্বেও চলাচল, একে অপরকে খুঁজে পেতে এবং মাছ ধরতে এরা শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করে।

এই পদ্ধতিকে বলা হয় ইকোলোকেশান। ডলফিনদের এই ক্ষমতা আর বাদুরের শব্দের সাহায্যে দেখা একই রকম।

শুশুকরা প্রায় অন্ধ এবং ঘোলা নদীতে চলতে ও মাছ শিকার করতে এরা পুরোপুরি ইকোলোকেশন বা প্রতিধ্বনিত শব্দের উপর নির্ভর করে। এদের আছে ছোট্ট চোখ এবং অসংখ্য ধারালো দাঁতসহ লম্বা চোয়াল। এদের সামনের পাখনাগুলো বড় ও ঘাড় নমনীয়।

আমাদের জলাশয়ে কোন রকম অস্বাভাবিকতা বিশেষ করে অতিরিক্ত মাত্রায় মাছ আহরণ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দূষণের কারণে সৃষ্ট যে কোন পরিবর্তনের বার্তা বহন করে ডলফিন ও তিমিরা। আমাদের মতই এদেরও পরিষ্কার পানি এবং পর্যাপ্ত মাছের প্রয়োজন।

ডলফিন ও তিমিরা আজ আমাদের জন্যই বিপদের মুখে। প্রতি বছর মাছ ধরার জালে আটকা পড়ে পানিতে ডুবে গিয়ে অনেক ডলফিন ও তিমি মারা যায়। ব্যাপকহারে মশারী জাল ব্যবহার করে চিংড়ি পোনা ধরার কারণে এদের খাবারের পরিমাণ আশংকাজনকহারে কমে যাচ্ছে।

নদীর ডলফিনরা বিশেষভাবে বিপদাপন্ন কারণ আপামর জনতা নদীর পানিকে দূষিত করছে, আবার উজানে বাঁধ নির্মাণ করে প্রজননের জন্য ডলফিনদের একত্রিত হতে দিচ্ছে না।

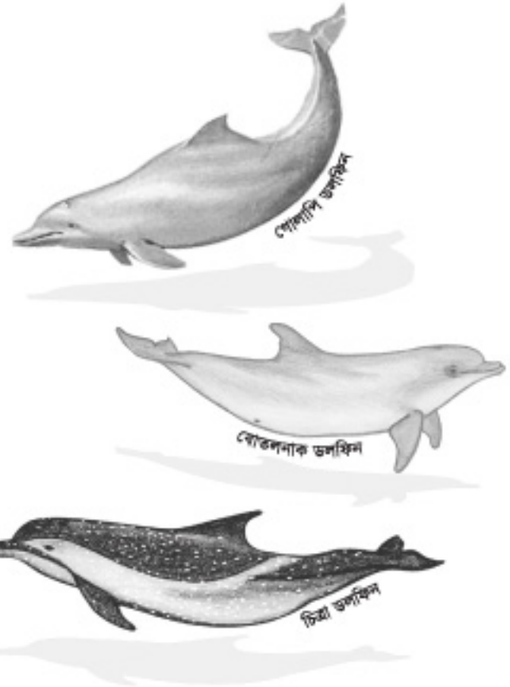

হাঙ্গর

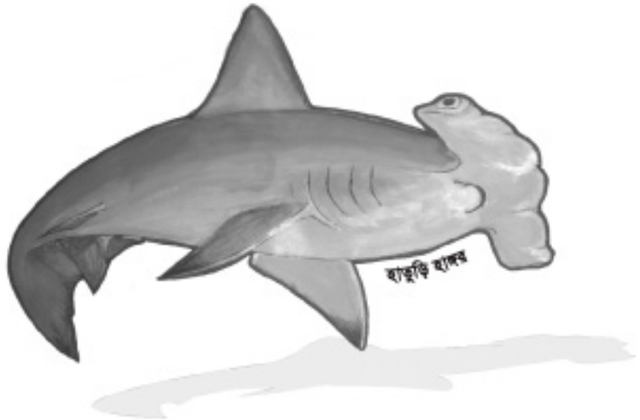

হাঙ্গররা এক ধরনের মাছ। কিন্তু সাধারণ মাছের মত এদের কোন শক্ত হাড় বা কাঁটা নেই। এর রয়েছে তরুণাস্থি নির্মিত কঙ্কাল যা আমাদের নাক ও কানের নরম হাড়ের মত। হাঙ্গররা অন্যান্য মছের মত ফুলকা দিয়ে শ্বাস নেয়, কিন্তু এর জন্য এদেরকে মুখ খুলে পানিতে সাঁতার কাটতে হয় যেন ফুলকার মধ্যে দিয়ে পানি যেতে পারে। তাই ভেসে থাকার জন্য এবং নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য হাঙ্গরকে সবসময় সাঁতার কাটতে হয়।

হাঙ্গররা গন্ধ, স্বাদ ও শোনার মাধ্যমে অনেক দূরের শিকারকে সনাক্ত করতে পারে। অন্যান্য মাছের মত এদেরও শরীর ও মাথায় সংবেদনশীল ইন্দ্রিয় আছে যা শিকার ধরতে সাহায্য করে।

হাঙ্গরের চামড়া দাঁতের মত তীক্ষ্ণ আঁশ দিয়ে ঢাকা থাকে। এই আঁশগুলো একটি শক্ত বাহ্যিক আবরণ তৈরি করে যা এদেরকে শিকারীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। আর এই শিকারীদের বেশিরভাগই হল অন্যান্য জাতের হাঙ্গর।

হাঙ্গরের আঁশ

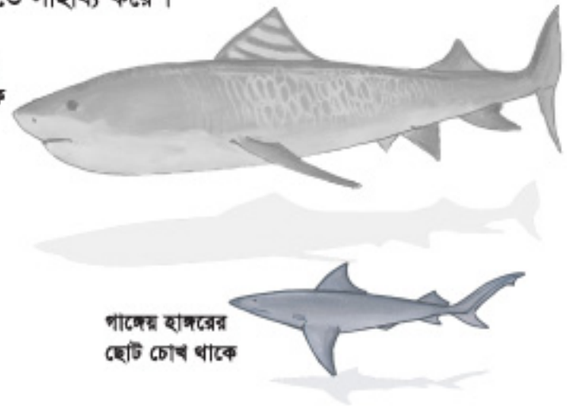

যেসব হাঙ্গররা পরিষ্কার পানিতে বাস করে তাদের থাকে বড় বড় চোখ আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি আর যারা শুধুমাত্র নদীর ঘোলা পানিতে বাস করে তাদের থাকে ছোট ছোট চোখ। এরা মূলত পানিতে চলাচল ও খাবার শিকার করতে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভরশীল।

অনবরত সাঁতার কাটার জন্য বেশিরভাগ হাঙ্গরের শরীর লম্বাকৃতির ও অস্বাভাবিক ভাবে নমনীয় হয়ে থাকে।

হাঙ্গরের পাখনাগুলো অনমনীয় এবং সাধারণ মাছের মত শরীরের সাথে বাঁকানো বা ভাঁজ করা যায় না।

হাঙ্গরদের চোয়াল শক্ত ও অসংখ্য দাঁতযুক্ত। দাঁত পড়ে যাওয়ার সাথে সাথেই নতুন দাঁত গজায়।

হাঙ্গরদের মাথার দুই পাশে শক্ত ফুলকা-প্লেট বা পাত যুক্ত পাঁচ থেকে সাতটি ফুলকাছিদ্র আছে।

হাঙ্গরের পিঠের, পেটের আর দুই পাশের পাখনাগুলো এদিক-সেদিক ঘুরতে ও শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

লেজের পাখনা ডানে ও বামে নড়াচড়ার মাধ্যমে হাঙ্গরকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

হাঙ্গররা ধীরে ধীরে বড় হয় এবং অল্প সংখ্যক বাচ্চা দিয়ে থাকে। এর মানে হল হাঙ্গরদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অনেক লম্বা সময়ের দরকার হয়।

অনেক হাঙ্গরই বাচ্চা জন্ম দেয়, আর এই বাচ্চাদেরকে পাপস্ বলা হয়।

কিছু হাঙ্গর খোসাসহ ডিম পারে, ডিমের ভিতরে বাচ্চা বড় হয়। এই সুরক্ষিত খোলসগুলো বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে। এগুলো প্রায়ই ম্যানগ্রোভ গাছের শিকড়ে আটকে থাকতে দেখা যায়।

জন্মের পর হাঙ্গরের বাচ্চাদের মায়ের কাছ থেকে আর কোন যত্ন-আত্তির প্রয়োজন হয় না ।

বালির নিচে লুকিয়ে থাকা শিকার খুঁজে পেতে হাতুড়ি হাঙ্গরের জুড়ি নেই। এদের চ্যাপ্টা ছড়ানো মাথায় অসংখ্য সংবেদনশীল ছিদ্র আছে। আর চওড়া মাথার দুই প্রান্তে অবস্থিত চোখ দিয়ে অন্যান্য হাঙ্গরের তুলনায় এরা অনেক ভাল দেখতে পায়। এই বিশেষ মাথার সাহায্যে এরা স্টিং রে-ও খুঁজে বের করতে পারে।

বাংলাদেশে অন্ততঃ তিন ধরনের হাতুড়ি হাঙ্গর আছে।

তিমি হাঙ্গর হল পৃথিবীতে বেঁচে থাকা সবচেয়ে বড় মাছ। এরা আকারে বাসের মত বড় হয়। বেলিন তিমির মত এই বিশাল হাঙ্গর ছোট ছোট মাছ খেয়ে থাকে।

মানুষ ও অন্য বড় হাঙ্গর ছাড়া হাঙ্গরদের আর কোন প্রাকৃতিক শত্রু নেই। এরা বাঘ ও ডলফিনের মত সবচেয়ে উঁচু স্তরের শিকারী।

হাঙ্গর মানুষের জন্য যতটা না বিপদজনক তার থেকে মানুষ হাঙ্গরের জন্য বেশি বিপদজনক। প্রতি বছর হাঙ্গরের আক্রমনের থেকেও অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ মারা যায় বজ্রপাতে, সাপের কামড়ে বা কুকুরের আক্রমণে।

হাঙ্গররা আমাদের জলাশয়ের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখে। এরা মূলত দূর্বল ও অসুস্থ মাছ খেয়ে বেঁচে থাকে, কারণ এ ধরনের মাছ সহজেই ধরা যায়। হাঙ্গর হারিয়ে গেলে অন্য অনেক মূল্যবান মাছ ও হারিয়ে যাবে।

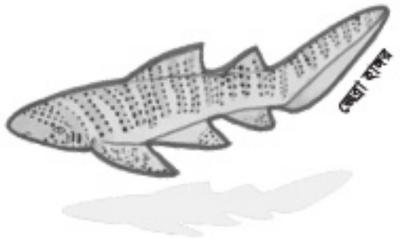

দুঃখের বিষয় হল আমাদের জলাশয় থেকে আশংকাজনকভাবে হাঙ্গররা হারিয়ে যাচ্ছে। ইলিশের জালের মত অন্যান্য মাছ ধরার জালে নির্বিচারে অসংখ্য হাঙ্গর মারা পড়ছে।

হাঙ্গরদের হারিয়ে যাওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে এদের পাখনা। রেষ্টুরেন্টে হাঙ্গরের পাখনার স্যুপ তৈরীর জন্য জেলেরা হাঙ্গরের পাখনা কেটে সরবরাহ করে। চীনের কিছু মানুষ খুব দাম দিয়ে স্বাদহীন, খাদ্য-পুষ্টিহীন এই স্যুপ খেয়ে থাকে।

ত্রিশটিরও বেশি জাতের হাঙ্গর বাংলাদেশে পাওয়া যায় যার মধ্যে ২৮ প্রজাতিই বিলুপ্তির সম্মুখীন। এর মানে হল এরা চিরতরে পৃথিবী থেকে হারিয়ে যেতে পারে।

শাপলাপাতা মাছ

শাপলাপাতা মাছেরা চ্যাপ্টা, এদের বিস্তৃত পাখনা আছে।

এদের চোখ মাথার চূড়ায় থাকে আর মুখ, নাক ও পাঁচজোড়া ফুলকা নিচের দিকে থাকে। এরা পাখির ডানার মত পাখনা ঝাপ্‌টে সাঁতার কাটে।

হাঙ্গরের সাথে শাপলাপাতা মাছের অনেক মিল আছে। হাঙ্গরের মত, এদের কঙ্কাল নরম হাড় বা তরুণাস্থি দিয়ে তৈরি। এরা ঝিনুক, শামুক, চিংড়ি, কাঁকড়া এবং ছোট মাছ খায়। এরাও শক্তিশালী ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে শিকার করে।

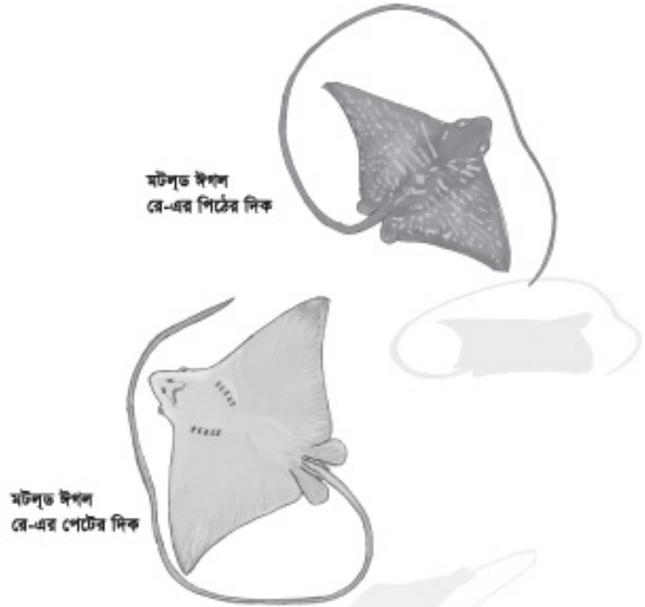

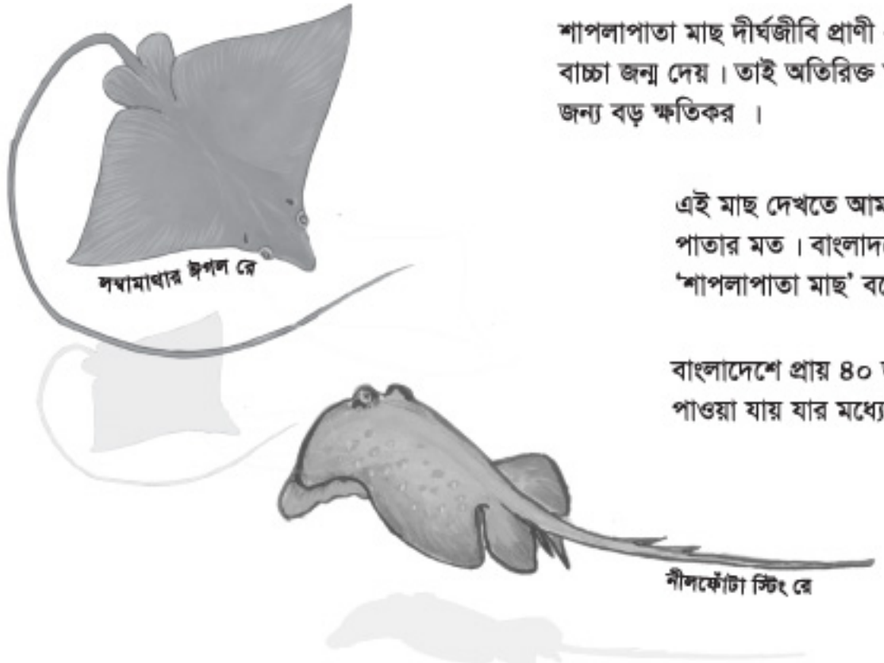

শাপলাপাতা মাছ দীর্ঘজীবি প্রাণী এবং তুলনামূলকভাবে কম বাচ্চা জন্ম দেয়। তাই অতিরিক্ত মৎস্য আহরন এদের জন্য বড় ক্ষতিকর ।

এই মাছ দেখতে আমাদের জাতীয় ফুল শাপলার পাতার মত। বাংলাদশেরে মানুষ তাই এদের 'শাপলাপাতা মাছ' বলে।

বাংলাদেশে প্রায় ৪০ জাতের শাপলাপাতা মাছ পাওয়া যায় যার মধ্যে ২২ টি বিলুপ্তির সম্মুখীন।

শাপলাপাতা ছাড়াও করাতমাছ, পীতাম্বরী মাছ, বৈদ্যুতিক রে, স্কেট এবং স্টিংরে এই দলের অন্তর্ভূক্ত।

এদের মধ্যে শুধুমাত্র স্কেট ডিম দেয়, বাকি সবাই বাচ্চা জন্ম দিয়ে থাকে। অনেক শাপলাপাতা মাছের সরু চাবুকের মত লেজ থাকে এবং লেজের মাথায় কাঁটা থাকে।

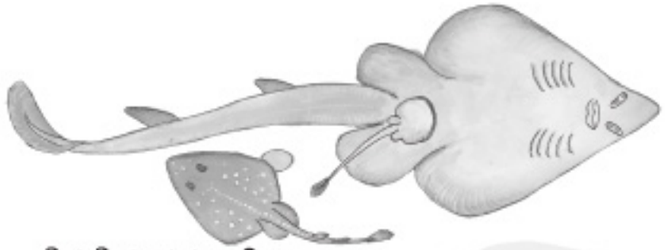

পীতাম্বরী মাছ বাচ্চা জন্ম দিচ্ছে

গাঙ্গেয় স্টিং রে

অতর্কিতভাবে শিকার ধরা এবং শিকারীর চোখকে ফাঁকি দেয়ার জন্য স্টিংরে নিজেদেরকে বালি বা কাদার নিচে লুকিয়ে রাখে, শুধুমাত্র চোখ দুটি বালির উপরে বের করে রাখে। এরা কেবলমাত্র শিকারী প্রাণীর বিরুদ্ধে এদের বিষাক্ত কাঁটা ব্যবহার করে। বিশ্বের প্রায় অর্ধেকেরও বেশি জাতের স্টিংরে আজ বিলুপ্তির সম্মুখীন আর বাংলাদেশের স্টিংরে সম্পর্কে এখনও তেমন কিছু জানা যায়নি।

ছোট দাঁতওয়ালা করাতমাছ

করাত মাছ এক ধরনের শাপলাপাতা মাছ যার দুইপাশে ছড়ানো পাখনা এবং একটি লম্বা ঠোঁট আছে। ঠোঁটের দুইপাশে করাতের মত ধারালো দাঁত আছে এবং ঠোঁটের সাহায্যে এরা বালির ভিতর থেকে চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ খুড়ে বের করে, শিকার অচেতন করে এবং নিজেদেরকে রক্ষা করে। এই বিশেষ ঠোঁটের কারণেই এরা জাল বা অন্যান্য মাছ ধরার সরঞ্জামে আটকে পড়ার ঝুঁকিতে থাকে। বাংলাদেশে যে তিন ধরনের করাত মাছ দেখা যায় তার সবগুলোই অনেক বিপন্ন।

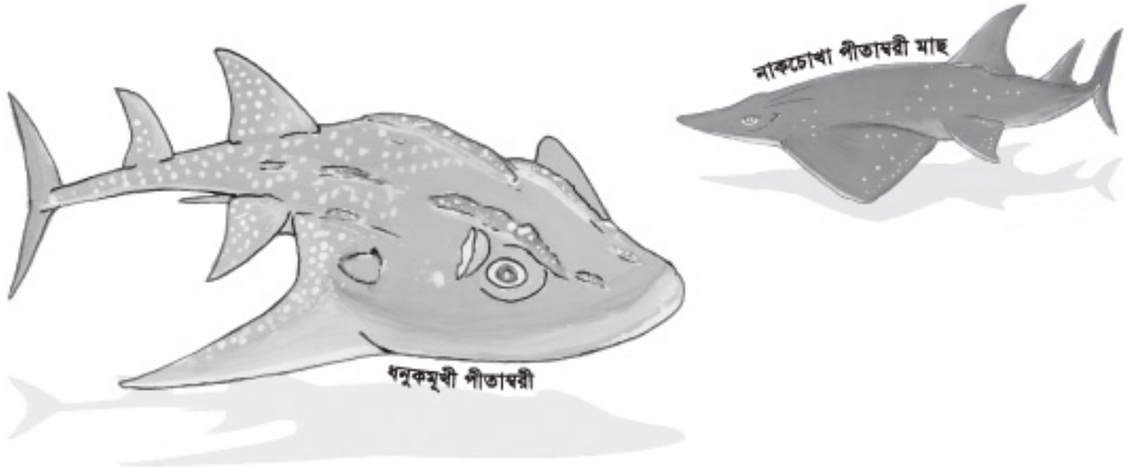

বাংলাদেশের উপকূলীয় ও মোহনার জলরাশিতে অন্তত পাঁচ ধরনের গিটারফিস বা পীতাম্বরী মাছ পাওয়া যায়। এদের গোল মাথা এবং চিকন লেজ রয়েছে যা অনেকটা গিটারের মত। পীতাম্বরী মাছ জলাশয়ের তলদেশে পাওয়া কৃমি এবং চিংড়ি ও কাকড়া জাতীয় খাবার খেয়ে থাকে। বাংলাদেশে কিছু কিছু মানুষ বিশ্বাস করে যে এই পীতাম্বরী মাছের তেল ও নরম হাড় শরীরের ব্যাথা দূর করতে পারে, তাই বাজারে এর বিশেষ চাহিদা আছে।

সামুদ্রিক কচ্ছপ

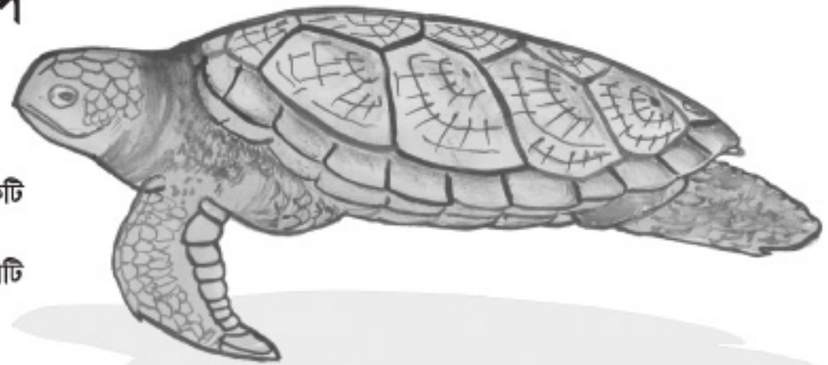

সামুদ্রিক কচ্ছপের শরীর একটি কঠিন খোলস দিয়ে ঢাকা থাকে। এদের শক্তিশালী চারটি পা অনেকটা ডলফিনের পাখনার মত কাজ করে যা এদেরকে পানিতে দ্রুত সাঁতার কাটতে সাহায্য করে।

সাগরের কচ্ছপ ১০০ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে।

মানুষের মত কচ্ছপও ফুসফুস দিয়ে শ্বাস নেয়। সাধারণত একটি সামুদ্রিক কচ্ছপ দুই ঘন্টার মত পানির নিচে ডুবে থাকতে পারে।

জেলীফিশ, স্কুইড, চিংড়ি, কাঁকড়া, ছোট মাছ, স্পঞ্জ এবং সামুদ্রিক ঘাস হল কচ্ছপের প্রিয় খাবার।

স্ত্রী কচ্ছপ বাসায় ডিম পাড়ছে

সামুদ্রিক কচ্ছপ ডিমপাড়া সরীসৃপ প্রাণীদের জাতভাই। স্ত্রী কচ্ছপ ডিমপাড়ার জন্যে সাগরের তীরে বা সমুদ্র সৈকতে একটি গর্ত খুঁড়ে বাসা তৈরি করে এর মধ্যে অনেকগুলো গোল গোল ডিম পাড়ে। ডিম রক্ষার জন্যে এরা বালি দিয়ে ভালোভাবে ঢেকে রাখে।

কচ্ছপের বাচ্চারা ডিম ফুটে বাসা থেকে বের হয়ে সোজা সাগরের দিকে এগিয়ে যায়। পুরুষ কচ্ছপরা সৈকত ছেড়ে যাবার পর আর সেখানে ফিরে আসে না। মেয়ে কচ্ছপরা বড় হলে আবার সেই সৈকতে ডিম পাড়ার জন্য ফিরে আসে।

আমাদের অনেক বালুময় সমুদ্র-সৈকত ও দ্বীপ আছে যা সামুদ্রিক কচ্ছপের ডিম পাড়ার জন্য আদর্শ। কিন্তু এসব সৈকতের অধিকাংশই এখন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কুকুর, গুঁইসাপ, শেয়াল, বন্য শুকর এবং মানুষ এদের বাসা থেকে ডিম চুরি করছে। মাছ ধরার জালে আটকা পড়েও অনেক সামুদ্রিক কচ্ছপ মারা যাচ্ছে।

সামুদ্রিক কচ্ছপ, এদের বাসা এবং ডিম বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন দ্বারা সংরক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও আজ বিলুপ্তির সম্মুখীন।

কচ্ছপের বাচ্চারা ঢেউয়ের শব্দ শুনে ও চাঁদের আলোর সাহায্যে সাগরে যাওয়ার পথ খুঁজে পায়।

পৃথিবীতে সাত জাতের সামুদ্রিক কচ্ছপ আছে। এদের মধ্যে পাঁচ জাতের কচ্ছপ বাংলাদেশের সমুদ্রে দেখা যায়, এদের মধ্যে মাত্র তিন জাতকে বাসা বানাতে দেখা গেছে।

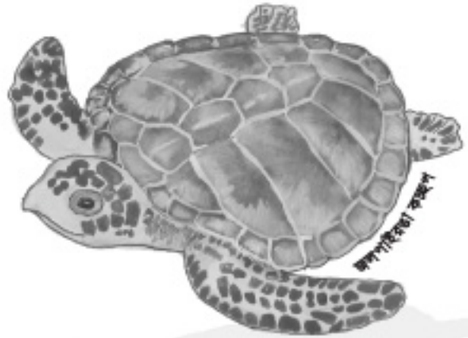

জলপাইরঙা এবং সবুজ কচ্ছপ বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। ঈগলমুখী কচ্ছপরা দুর্লভ এবং শুধুমাত্র সেন্টমার্টিন দ্বীপে এদের বাসা বানাতে দেখা যায়।

চামড়াপিঠ বা পুরু চর্ম বিশিষ্ট কচ্ছপ বা লেদারব্যাক পৃথিবীর বৃহত্তম কচ্ছপ। একটি পূর্ণবয়স্ক লেদারব্যাক কচ্ছপ আকারে সিএনজি অটোরিকশার চেয়ে বড় হয়। শক্ত খোলসের পরিবর্তে এদের শরীর মোটা চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। চামড়ার ঠিক নিচেই একটি মোটা চর্বিস্তর থাকে যা এদের শরীরকে গরম রাখতে সাহায্য করে। অন্য কচ্ছপের এই প্রতিরক্ষা স্তরটি নেই। লেদারব্যাক কচ্ছপ প্রায় ৩০০০ ফুট গভীরে ডুব দিতে পারে। অন্য কচ্ছপরা এতো গভীরে যেতে পারে না। জেলীফিশ এদের প্রধান খাবার।

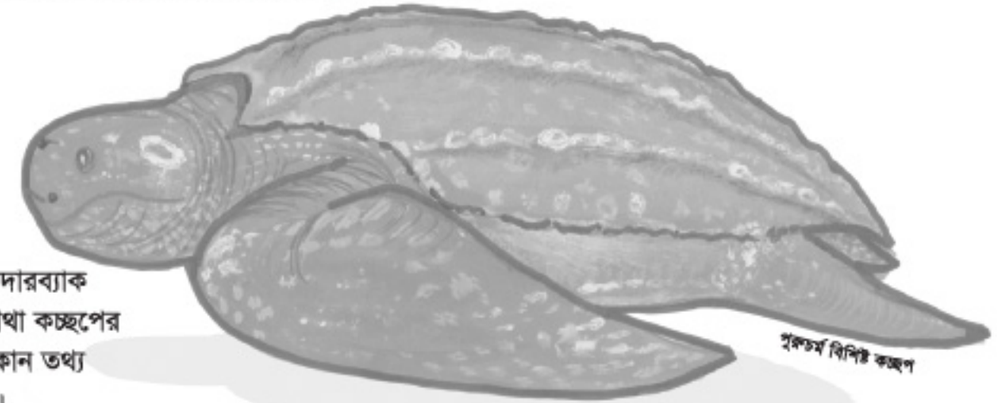

বাংলাদেশে লেদারব্যাক অথবা আংটামাথা কচ্ছপের বাসা তৈরির কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

আমরা কিভাবে বাংলাদেশের ডলফিন, হাঙ্গর, শাপলাপাতা মাছ এবং সাগরের কচ্ছপ রক্ষা করতে পারি?

বাংলাদেশে এই আশ্চর্য জলজ প্রাণীদের সম্পর্কে এখনও অনেক কিছু জানতে বাকি। কিন্তু আমরা এটুকু নিশ্চিত জানি যে এদের বেঁচে থাকাটা জরুরী। টেকসই মৎস্য সম্পদের ব্যবস্থাপনায় এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রয়োজনীয় আমিষ ও আয়ের জন্য এই মৎস্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল।

ডলফিন, হাঙ্গর, শাপলাপাতা মাছ এবং সাগরের কচ্ছপ ধীরে ধীরে বড় হয় এবং মাছ ধরার জালে আটকা পড়ে যে হারে এরা মারা যায় ঠিক সে হারে এরা জন্মায় না ফলে ক্ষতিপূরণটা একই হারে হয় না। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সাগরের পরিবেশে যে পরিবর্তন ঘটছে তা এসব প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য বাঁধা তৈরি করছে।

বাংলাদেশে সকল ডলফিন, হাঙ্গর, শাপলাপাতা মাছ এবং সাগরের কচ্ছপ আইন দ্বারা সংরক্ষিত।

এই প্রাণীদের বাঁচাতে আপনিও নিম্নোক্তভাবে সাহায্য করতে পারেন-

- আপনার জালে আটকা পড়া ডলফিন, হাঙ্গর, শাপলাপাতা মাছ এবং সাগরের কচ্ছপ ছেড়ে দেন
- যে সময়ে এবং যেসব জায়গায় মাছ ধরা বৈধ শুধু সে সময়ে এবং সেসব জায়গায় মাছ ধরেন
- কচ্ছপের ডিম পাড়ার জায়গাগুলোকে শিকারীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন
- ডলফিন, হাঙ্গর, শাপলাপাতা মাছ এবং কচ্ছপ বা এদের কোন অংশ কেনা-বেচা করবেন না বা খাবেন না
- পানিতে কোনরকম ময়লা-আবর্জনা, বিশেষ করে প্লাস্টিক ফেলবেন না
- আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের বিষয়ে অন্যদেরকে জানান এবং এই সম্পদ রক্ষায় উৎসাহিত করেন

আশ্চর্য সুন্দর এই জলজ প্রাণীদের সংরক্ষনের মাধ্যমে আপনিও বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী রক্ষায় কাজ করতে পারেন।

ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি বিজ্ঞান, শিক্ষা এবং সংরক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বন্যপ্রাণী এবং এদের বাসস্থানসমূহ সংরক্ষন এবং প্রকৃতির গুরুত্ব নিরূপনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে আসছে। গত দশ বছরের বেশি সময় ধরে ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি বাংলাদেশ প্রোগ্রাম বাংলাদেশের বিচিত্র জলজ প্রাণী রক্ষার উপযুক্ত সমাধান খুঁজে পেতে স্থানীয় মৎস্যজীবি সম্প্রদায়, সরকারি সংস্থাসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষকদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে।

বিভিন্ন ধরনের বিপন্ন এবং হুমকির সম্মুখীন ডলফিন ও তিমির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসাবে আমরা বাংলাদেশকে চিহ্নিত করি। অভিনব শিক্ষামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা স্থানীয় জনগণকে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনে উৎসাহিত করে থাকি। আমরা মৎস্যজীবি সম্প্রদায়, সরকারি সংস্থাসমূহের সাথে কাজ করার মাধ্যমে টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও জীবিকাকে উৎসাহিত করণ এবং সংরক্ষিত এলাকা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই আশ্চর্য প্রাণীদের রক্ষার্থে কাজ করে যাচ্ছি।

আমাদের এই বিশাল জলরাশি বিচিত্র সব প্রাণীতে ভরপুর, এদের বেশিরভাগের সম্পর্কে আমরা খুব অল্পই জানি। মাছের পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করে বঙ্গোপসাগর এবং আমাদের নদীসমূহের স্বাস্থ্য ও প্রাচুর্যতা রক্ষায় এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রতি বছর মাছ ধরার জালে আটকা পড়ে অসংখ্য ডলফিন, হাঙ্গর, শাপলাপাতা মাছ এবং সামুদ্রিক কচ্ছপ মারা যায়। আমরা সবাই একসাথে কাজ না করলে খুব শিগগিরি এদেরকে আমরা হারিয়ে ফেলব। আমরা মনে করি এটি একটি বড় বিপর্যয়, আপনিও কি তাই মনে করেন না?

বাংলাদেশের ডলফিন ও তিমি, হাঙ্গর, শাপলাপাতা মাছ এবং সামুদ্রিক কচ্ছপ সম্পর্কে মজার তথ্য তুলে ধরা হয়েছে এই বইয়ে। আমাদের আশা এই বইটি আপনাকে জলজ প্রাণিকূল রক্ষায় আমাদের সাথে কাজ করতে উৎসাহিত করবে।

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE WCS WorldFish